পল্লবের উপন্যাসের গল্প

উপন্যাসটা খুঁজছে পল্লব। লিখবে বলে একটা উপন্যাসের বিষয় খুঁজছে তা নয়, কারণ উপন্যাসটা লেখা হয়ে গেছে। ত্রিদিবের এই উপন্যাসটা নিয়ে যেমনটা ঘটেছে, বাংলা কোনো উপন্যাস নিয়ে এর আগে এত মিডিয়া তোলঘোল হয়েছে বলে মনে হয়না। তার উপরে মজাটা এই যে, উপন্যাসটা আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি। দু-একজন দাবি করেছিল সেই সময়, ত্রিদিবের ওই সেনসেশনাল মৃত্যুর ঠিক পর পর, তারা দেখেছে উপন্যাসটা। কামরূপের যে সস্তা রেস্টহাউজে উঠেছিল ত্রিদিব, তার ম্যানেজার কাম মালিক প্রাণেশ লোহকর দাবি করেছিল, তার কাছ থেকেই একটা পলিপ্যাক নেয় ত্রিদিব, অহম সিল্ক হাউজের, তার মধ্যে অনেক পাতার একটা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ত্রিদিবকে নিজের হাতে ঢোকাতে দেখে লোহকর। এটা নিয়েও সেসময় প্রশ্ন উঠেছিল, বাংলা লেখালেখিতে, কলকাতায়, যারা প্রথম সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্ভর হয়ে গেছিল, তাদের একজন হয়ে, কেন হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি হবে ওটা, আরো যে উপন্যাসটা ত্রিদিব লিখছিল ভাবছিল বেশ কয়েক বছর জুড়ে?

ত্রিদিব নিজের প্রাকমৃত্যু নোটে, সাড়ে নয় পাতা দীর্ঘ, এবং তার আগের কয়েকবছর ধরে, নানা জায়গায় একে উল্লেখ করে গেছে এমন একটা উপন্যাস বলে --

> যা একই সঙ্গে জীবন ও অন্ধ হওয়ার পর দিবাস্বপ্ন, যা একই সঙ্গে একটা টেক্সট এবং হত্যা আকাঙ্খা, তুমি এই উপন্যাসকে নড়তে দেখলে বাক্যের টেন্স জুড়ে, অতীতকে দেখছ পুনরাবৃত্ত নিত্য বর্তমান, যাকে তুমি পড়তে চাইবে, কারণ, এটাই তোমার একমাত্র পরিচিত উপন্যাস, উপন্যাস যা তুমি লিখেছিলে তোমার ভবিষ্যতে

ঈশ্বর জানেন, এর অর্থ কী, এবং বোধহয় ঈশ্বর জানেন না যে এর কোনো অর্থ নেই, তাই বাক্যগুলোকে, গদ্যটুকুকে একটা সৌকর্য দিয়েছেন, একটা স্মার্ট গতি, পড়তে ভাল লেগেছিল পল্লবের। দৈনিকের রবিবাসরীয় সাপ্লিমেন্টে পুরো ওই মৃত্যুলিপিটাই পড়েছিল পল্লব। ত্রিদিবের লেখা যা পড়েছে পল্লব, সবই একটু একই টাইপের লেগেছে, গদ্য হিশেবে পড়ে যেতে খারাপ লাগে না, কিন্তু, কাহিনী হিশেবে টানে না, এবং শেষ অব্দি খুব একটা বেশি কিছু বলার থাকে বলেও মনে হয়নি পল্লবের। আর একটু রিপিটিটিভ লাগে, একই বাক্যও বোধহয় রিপিট করতে দেখেছে এক লেখা থেকে অন্য লেখায়।

এই উপন্যাসটা আসলে অত প্রচার পেয়েছিল ত্রিদিবের মৃত্যুর ওই সনসনাতি সেটিং-এর জন্যে। এর আগের দু-তিন বছর ধরে ত্রিদিবের লেখা বন্ধ হয়ে গেছিল । খবরের কাগজে তাই লিখেছিল। কেউ খুব ভালো করে জানেনা, ত্রিদিব সেই সময়টা জুড়ে ঠিক কোথায় ছিল। যদ্দূর সম্ভব, নানা জায়গায় এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেউ কিছু জানত না, ওর বাড়ির লোকও না। ওর স্ত্রী নিজেই ভিআইপি, তখন এমএলএ ছিল, এখন রাজ্যসভার মেম্বার, সেও জানত না, ত্রিদিব কোথায়। ওই সময় সাংবাদিকদের খোঁচাখুঁচিতেই বেরিয়েছিল, বিহারের ঝাঝা স্টেশনে একবার পুলিশের সঙ্গে কোনো একটা অশান্তি করে ত্রিদিব, উইদাউট টিকিট একটা বাচ্চা মেয়েকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া নিয়ে। রেল পুলিশের সার্জেন্টকে ত্রিদিব একটা চড় মারে, এবং তারপর ঝাঝা স্টেশনের পুলিশ

ত্রিদিবকে ল্যাংটো করে বেঁধে রেখে দেয়, এবং নিজের পায়খানা খেতে বাধ্য করে। এগুলো সাংবাদিকদের যে জানিয়েছিল, সোমেন রাহা, এর আগে কদিন ঝাঝায় তার বাড়িতেই উঠেছিল ত্রিদিব। সোমেন একসময় কলকাতার লিটল ম্যাগাজিনে লিখত, তখন থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ত্রিদিবের।

পরে সোমেন টিভি সাংবাদিকদের জানায়, তখন সে যে এই নিয়ে কোনো হইচই করেনি, তার একটা কারণ, সে তখন বিহারে সরকারি চাকরি করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সোমেনের কথা অনুযায়ী, চড় মারার ঘটনাটায় কী অন্যায় ছিল ত্রিদিবের তা সে ঠিক জানেনা, কিন্তু, পরে, পুলিশের প্রত্যাঘাতকালীন, ত্রিদিবকে ভয় পেয়ে ভেঙেচুরে কিলবিল করতে দেখে সে, যা তার মাথায় ত্রিদিবের এত বছরের ছবিটাকে, অন্যরকম আনকম্প্রোমাইজিং লেখকের ছবিটাকে, নষ্ট করে দেয়। টিভিতে সোমেনের এই কথাগুলোর কিছু অংশ দেখিয়েছিল। কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল সোমেন। কান্না দেখতে তো খারাপ লাগে সবারই, কিন্তু, তার পরেও যুগপত অবাক হয়েছিল পল্লব এবং তার একটা হাসি পাচ্ছিল। মনে মনে কিছু ইমেজ বানিয়ে নিতে পারে বটে, পাবলিকের যে কবে বয়েস হবে। আর, এমন যদি হয়, যে সোমেন আসলে কাঁদছিল ইমেজ ভাঙায় নয়, নিজে যে বিট্রে করেছিল, যদি করে থাকে, সেই অপরাধবোধে, তাহলে তো আরো চিত্তির। এত কাঁদার কী আছে, করেছিস বেশ করেছিস, তোর যা খুশি তাই করেছিস, কার বাপের কী, তোর বাপের বা অন্যের বাপের, কার কী, মনে হয়েছিল পল্লবের। আর একটা কথাও মনে হয়েছিল পল্লবের, এই সোমেন ব্যাটা পুরোটাই বানাচ্ছে না তো? এই তালে একটু প্রচার হয়ে গেল, সবকিছুর পরও, কান্না তো ভালই কাটে। এই যে দেখতে দেখতে পল্লবের খারাপ লাগছিল, কিছু একটা অ্যাট-লিস্ট লাগছিল, ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল না, এটাই তার প্রমাণ।

ঝাঝার পরে অনেকদিন কোনো খোঁজ ছিল না ত্রিদিবের। প্রায় দেড়বছর পরে, ওই কামরূপ মন্দিরের পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলে, ঠিক গুহা না, পাথরের ভিতরকার খাঁজ থেকে ত্রিদিবের ডেডবডি খুঁজে পায় পুলিশ। ডেডবডিটার বিষয়ে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টা ছিল এই যে গোটা বডিতে কোনো পচন ছিল না কোনো পোকাও ধরেনি। অথচ গোটা শরীরটা শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে, উপরে চামড়ার একটা আবরণ। পুলিশের লোকেরা নিজেরাও ভয় পেয়ে গেছিল সেই বডি দেখে। আসামের পুলিশ, আলফার ওই সব ঘাপলা হ্যান্ডল করে, রেগুলার ওদের কাজই হল জ্যান্ত আধমরা এবং সদ্য এনকাউন্টার বলে গুলি করে মারা রাশি রাশি বডি পুঁতে ফেলা, এবং কিছুদিন বাদে আলফার আরো একটি গণহত্যা ও গণকবর আবিষ্কার করা, সেই মালেরা যখন চমকেছিল, বডিতে সত্যিই দম ছিল। জিও বস, ত্রিদিবকে এই জায়গাটায় একটা সেলাম না-করে পারে না পল্লব। সে বডির এমন চেহারা যে একটা টিভি চ্যানেল সেটা দেখানোর পরই, সরকারি সিদ্ধান্তে ওটা দেখানো বন্ধ করা হয়। একাধিক শিক্ষাবিদ এতে আপত্তি করে। এই শিক্ষাবিদ, সরকার, এদের তো আর কোনো কাজ নেই।

বডির ওই অবস্থা নিয়ে সেই সময় খুব লেখালেখি আর আলোচনা হয়েছিল কাগজে, ম্যাগাজিনে, টিভিতে। অনেক ডাক্তার বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ -- এরা সব এসেছিল। এদের কাছে মূল প্রশ্নটা ছিল এই যে, শরীরে জল তথা মেদ এবং পেশিকোষের পরিমাণ ওই ভয়ানক ভাবে কমে গেল কী করে? ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এর কোনো উত্তর পাচ্ছিল না। টিভি চ্যানেলে একজন ডাক্তার অবস্থাটা ব্যাখ্যা

করে বুঝিয়েছিল, ‘মরুভূমির চূড়ান্ত উত্তাপে এবং শুষ্কতায় কয়েক বছর থাকলে একটা মৃতদেহ অতটা শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেখানেও জীবাণু এবং পোকামাকড়ের সংক্রমণ এড়ানো যাবে না’। সেই সময়টার কথা মনে আছে পল্লবের। বাংলা উপন্যাস তথা সাহিত্যের একেবারে মোচ্ছব। প্রায় দু মাস ধরে সাহিত্য বিষয়ক প্রোগ্রামগুলোর টিআরপি এতটাই বেড়ে গেছিল যে এরা কোল্ড ড্রিংক্স, সেলফোন, চিপস, স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি হাই-প্রোফাইল বিজ্ঞাপন পেতে শুরু করেছিল। কোনো কোনোটা এমন কি সন্ধের প্রাইমটাইম স্লটও পাচ্ছিল। তারপর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, আবার এই প্রোগ্রামগুলো ফিরে গেছে এদের নিজেদের জায়গায়।

শেষ অব্দি ব্যাখ্যাটা করেছিল যশলোক হাসপাতালের ডাক্তার ভার্গব। ভার্গব নিজে অনেকদিন জাপানে ছিল। জাপানে এটা নাকি অনেক আলোচিত এবং গবেষিত একটা বিষয়। চিনা এবং জাপানি বৌদ্ধ মংকদের মৃতদেহ অনেক সময়ই এই রকম বিশুষ্ক মমি অবস্থায় পাওয়া যায়। ভার্গব যা বলেছিল, সেটা শুধু ইন্টারেস্টিং না, খুব জারিং, নড়িয়ে-দেওয়া লেগেছিল পল্লবের। একটা ধাক্কা যা সে আজো এতদিনেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনো, অতনুদার বাড়িতে ওরা প্রায়ই বসে, নিজেদের লিটল ম্যাগাজিন ‘এবং পঞ্চেন্দ্রিয়’ নিয়ে, বসলে প্রায়ই মাল খাওয়া হয়, অতনুদা কাস্টমসের অ্যাপ্রেইজিং অফিসার, বিদেশি মদ পাওয়া সহজ, সেখানে পল্লব নিজে থেকে কিছু বলতে গেলেই, প্রায়ই কেউ না কেউ বলে ওঠে, প্লিজ, ত্রিদিবের বডি না, ত্রিদিবের লেখাও না, নেশা কেটে যাবে, একদিন অন্য কিছু বল মাইরি, প্লিজ পল্লব।

পল্লব রাগে না, কোথাও একটা পছন্দই করে বলাটা। কী একটা পেয়ে গেছে সে, ত্রিদিবের বডি নিয়ে ওই প্রোগ্রামটা থেকে। শুধু সে কেন, কলকাতার খুব কম লোকই সেদিন মিস করেছিল প্রোগ্রামটা, সকালে খবরের কাগজেই ছিল -- আজ ত্রিদিবের মৃত্যুরহস্য ব্যাখ্যা টিভি চ্যানেলে, সন্ধে সাতটায়। এখানে একটা মজা আছে, খুব কম লোকই সেটা খেয়াল করেছিল, উপন্যাসটা একবার হাতে আনতে পারলে তার সম্পাদকের ভূমিকা তো সে-ই লিখবে, তাতে এটা লিখবে পল্লব। পুলিশ তো শেষ অব্দি ভাড়াটে খুনি নয়, প্রাইভেট সেক্টর নয়, কোনো ব্যক্তিগত যোগ্যতার আর প্রয়োজন কই সরকারি পয়সায় মানুষ মারার পাবলিক সেক্টরে, বুদ্ধিশুদ্ধির দরকারই পড়ে না, ধরো আর মারো, তাই সেই পুলিশের মাথাতেই আসেনি, ত্রিদিবের ডেডবডির পাশে পড়ে থাকা, পাথরের নিচে চাপা, ওই সাড়ে নয় পাতা লেখা পড়ে দেখার বা, নিজেরা যদি বাংলা না-ও পারে, কাউকে পড়িয়ে দেখানোর। তাতে বিশদ ভাবে গোটাটাই দেওয়া ছিল, দেওয়া ছিল

> আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাব্য মেথড, যা সত্য নয় এখনো, ফিকশন, সত্য হয়ে উঠছে, তাই পতিত হল ফিকশনের অমর্ত্যের অসম্ভব অনন্ত সম্ভাব্য থেকে মৃত সম্ভবের বিবরণে

ওই নোটসেরই ভাষা এটা। অবভিয়াসলি পুলিশের নয়, পুলিশ প্রজাতির আসৃষ্টি প্রজন্মাদি জুড়ে এমন গদ্য লেখা কারুর না-জন্মানো বাবার পক্ষেও সম্ভব নয়। নিজের মাথায় পুলিশ বিষয়ে এই শেষ বাক্যটা নামিয়েই একটু মন খারাপ হল পল্লবের। পরে, অন্যদের সামনে, ঠিক জায়গায় ফের মাথায় আসবে তো -- বেড়ে নেমেছিল। বরং এটা উপন্যাস বেরোনোর সাংবাদিক সম্মেলনের জন্যেই থাক,

‘এবং পঞ্চেন্দ্রিয়’-র কারুর সামনে বললে, হয় ঝেড়ে দেবে, নয় বলবে, আবার সেই ত্রিদিবের বডি?

ভার্গব বলেছিল, ‘চিন ও জাপানের বৌদ্ধ মংকরা নিজেদের নির্মলতা এবং পবিত্রতার চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে প্রায়ই এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করত। এই প্রক্রিয়ার মূল উপাদান পাইন জাতীয় গাছের ছাল পাতা বা শুকনো ফল এবং আর্সেনিক তথা আর্সেনিক যৌগ খুব বেশি আছে এমন কোনো পাহাড়ি প্রস্রবণের জল। মংকরা, একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে শুধু পাইন গাছের ছাল আর ওই পাহাড়ি ঝোরার জল ছাড়া আর কিছু খেত না। তাদের শরীরে পাইন থেকে আসা জৈবযৌগ এবং আর্সেনিক যৌগ দুই-ই পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়ে উঠত। পাইন যৌগ শরীরে জলের পরিমাণ অসম্ভব রকমের কমিয়ে আনে, আর এই পৈশাচিক ডায়েট শরীরের মেদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর আর্সেনিক তৈরি করে এমন একটা আভ্যন্তরীণ বিষাক্ততা যা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে জীবাণু বা কীটের সংক্রমণ তো বন্ধ করেই দেয় মৃত্যুকেও নিকটতর করে, এবং আর্সেনিক শরীর থেকে যায়না কখনো, যত মাইক্রোস্কোপিক পরিমাণেই হোক। এটা আমাদের ফরেনসিক ডাক্তারদের হাতে একটা বড় অস্ত্র। নেপোলিয়নকে ব্রিটিশরা যে বিষ খাইয়ে মেরেছিল, এটাও প্রমাণ করা গেছে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তার কবরস্থ দেহ খুঁড়ে আর্সেনিকের পরিমাণ থেকেই।’ ভার্গবের বলে চলা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল নিজের কাজটা বেশ ভালবেসে করে। ভার্গবকে বেশ ভাল লাগছিল পল্লবের। সমস্ত লোকই নিজের কাজ নিয়ে এত ক্লান্ত। আবার যদি শৈশবে ফেরা যেত, পাতাখোর বাবাকে ছেঁটে ফেলে, পল্লবকে চয়েস দেওয়া হত, কী লেখাপড়া করবে, সে কি এই শব-ব্যবচ্ছেদ এবং পরীক্ষার ভার্গবের কাজটাই নিত?

হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে ভার্গবের বলা তখনো শেষ হয়নি। ‘মংকরা যখন দেখত, শরীরে মৃত্যুর পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে, ওই পাইন-খাদ্যটুকুও বর্জণ করত, এবং জ্ঞান থাকা অব্দি একাসনে বসে জপ করে চলত। মৃত্যুর এই চর্চিত এবং স্বেচ্ছাশীল প্রক্রিয়াই মৃত্যুর পর ওই অপচনশীল অকীটদংষ্ট বিশুষ্ক মমি সৃষ্টি করত। যা, এই মংকদের কাছে ছিল আর এক আকারের মৃত্যুহীনতা।’

বলতে বলতে ভার্গব উপরে শূন্যের দিকে তাকিয়েছিল, নিজের মধ্যে ও কি জাপানি বৌদ্ধ মনাস্ট্রির সেই আবহটা ফিরে পেতে চাইছে? এর পর ভার্গব যেটা বলেছিল সেটা এই সাহিত্য-সাহিত্যিক বিষয়ক প্রোগ্রামটাকেই এক অর্থে একটা সাহিত্য করে দিয়েছিল। পল্লব ভাবছিল, এটা কি সত্যিই সে দেখছে, না, নিজের মনে বানিয়ে নিচ্ছে, গাঁজা না-খেলেই যেমন ও বানায়, বানাতে বোধহয় হয়ই, আর কী করবে?

ভার্গব বলেছিল, ‘এবার আমি যেটা বলছি, সেটা আমি বলছি না, হুবহু কোট করছি। ডাক্তার মর্টিমার, আমার মতই এক ডাক্তার, শার্লককে বলেছিল, কোনান ডয়েলের হাউন্ড অফ বাস্কারভিল উপন্যাসে, আই হ্যাড হার্ডলি এক্সপেক্টেড সো ডলিকোসেফালিক এ স্কাল, অর সাচ ওয়েল মার্কড সুপ্রা-অর্বিটাল ডিভেলপমেন্ট। আজ সকালে, আপনাদের কী বলব তার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, যেন, কোনান ডয়েল, আজ আমি কী বলব সেটা ভেবে আগে থেকে এই বাক্যটা লিখে রেখে গেছেন। সত্যিই লোয়ার বেঙ্গলের এথনিক গ্রুপে যে ধরণের খুলি দেখা যায়, সেই ব্রাকিসেফালিক স্কাল থেকে এই স্কালটা এতটাই পৃথক। এবং, শরীরটা এতটা কঙ্কাল হয়ে গেছিল যেন এটা আমার নজর এড়িয়ে না-যাওয়া নিশ্চিত করতেই। এর খুঁটিনাটিতে আর যাবনা, শুধু এইটুকু ছাড়া যে এর

মানে এই জনগোষ্ঠীতে সচরাচর যে চওড়া ধাঁচের খুলি পাওয়া যায়, তার তুলনায় এই খুলি অনেক বেশি লম্বাটে, এবং একসময় নৃতাত্ত্বিকরা খুব দৃঢ় ভাবে এটা বিশ্বাস করতেন যে এই ধরণের খুলি মস্তিষ্কের খুব উঁচু মানের পরিচয়। যেন এই লেখকের কোনো জিনগত উত্তরাধিকার থাকতেই পারত শার্লক হোমসের সঙ্গে যদি তিনি কোনো বাস্তব চরিত্র হতেন। স্কালগত ভাবে এটা সত্যি, আমি বলতে পারি, আর মননগত ভাবে সেটা কতটা সত্যি সেটা আপনারা, তার পাঠকেরা, বলতে পারবেন।'

ভার্গব জানিয়েছিল, এই মৃত্যুটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সে দেখেছে, আসামের কামরূপ সহ বেশ কিছু পাহাড়ি প্রস্রবণে বেশ কয়েকবার চড়া হারে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আর, এই লেখকের মৃতদেহ পাথরের যে ফাটলে পাওয়া গেছে, তার মধ্যেটা ভরা ছিল পাইন গাছের পাতা আর পাইন-কোনে, যা বাইরে থেকে ছিঁড়ে বা কুড়িয়ে আনা হয়েছিল। এবং, পরে, ভিসেরায় পাইন অবশেষও পাওয়া গেছিল। কিন্তু, ভার্গবের মতে, বিস্ময়কর এই যে, একজন অটেকনিকাল লোক হয়ে এই লেখক এই তথ্য যদি কোথা থেকে পড়েও থাকে, এই অবিশ্বাস্য মনোবল সে পেল কোথায়? জাপানে বৌদ্ধ মংকদের গোটা শিক্ষানবিশিটাই থাকে শারীরিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করতে শেখা। বছরের পর বছর ধরে। একজন সাধারণ মানুষের কাছে যা স্বপ্নের অতীত। পোস্ট-মর্টেম এবং সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স, ময়নাতদন্ত এবং পরিস্থিতিগত প্রমাণ, দুই মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চার মাস শুধু জল এবং পাইন খেয়ে কাটিয়েছে এই লেখক, এবং তারপর আরো প্রায় দুই সপ্তাহ বেঁচে থেকেছে সম্পূর্ণ খাদ্যহীন পানীয়হীন, যা তার স্বাভাবিক শরীরকে, ক্রমে, ধীরে, চামড়ায় ঢাকা একটা কঙ্কালে পরিণত করেছে, একটু একটু করে মেদ ও জলের প্রতিটি কণা তার শরীর থেকে নিঙড়ে বার করে দিয়ে। অবশ্য এই শেষ দু সপ্তাহের একদম শেষদিকে তীব্র অকল্পনীয় যন্ত্রণাটা, মূলত পৌস্টিকতন্ত্রে এবং পেশিতে পেশিতে, পাইন আর আর্সেনিকের কারণে এতটাই বেড়ে উঠবে যে তা স্নায়ুতন্ত্রকেই অসাড় করে দেবে, তখন কোনো কিছুই আর অনুভব করার থাকবে না, না খিদে না তেষ্টা না বেদনা। কিন্তু তার আগে অব্দি?

শুনতে শুনতে পল্লবের একটা বিমূঢ় বাকরুদ্ধ স্তব্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল। কোনো বই, কোনো সিনেমা, বাবুর আনা কোনো ব্লু-ফিল্ম তার ভিতরে কোনোদিন এই উত্তেজনা, এই মুগ্ধতা তৈরি করেছে বলে মনে করতে পারে না পল্লব। সে আর ত্রিদিব দুজনেই বাঙালি, একই বাঙলা ভাষা, একই বাঙলা সাহিত্য, সে পল্লব নিজেও লিটল ম্যাগাজিন করে, সত্যিই তার কি এক গৌরবের অনুভূতি তৈরি হয়েছিল শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। কে পারে এমন, বলে উঠেছিল পল্লব। সে জানে এত সত এত সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া তার নিজের কমই হয়েছে এই জীবনে। এখনো তার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াটা কাজ করে, বোঝে পল্লব, যে কারণে সে উপন্যাসটা খোঁজার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। এখনো। এত দিন পরেও। ছাড়তে পারে না কিছুতেই।

এখনো, প্রায়ই রাতে, শোয়ার পরে, নিজের মাথায় ত্রিদিবের মৃত্যুর আগের সময়টাকে রিওয়াইন্ড আর প্লে করেই চলে পল্লব। কখনোই তাকে সেই একই সর্বঅতিক্রমী সব-নড়িয়ে-দেওয়া অনুভূতি দিতে অপারগ হয়না দৃশ্যগুলো। প্রতিটি অন্ত্র প্রতিটি হাত পা হাড়ের জোড় পেশি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অনুভূতি, আসলে কোষগুলোয় নাকি সেটাই ঘটতে থাকে, মিনিট মিনিট মিনিট একটা লোক

একটা লেখক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাচ্ছে, ছেদহীন মরে চলেছে সেকেন্ড মিনিট দিন রাত্রি মাস জুড়ে। এই লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হবে, একটা মুহূর্তের ছেদও নয়, তাহলেই মরাটা থেমে যাবে। রাত্তিরে শোবার পরে, ত্রিদিবের মৃত্যুটা প্রায় রোজই একবার করে মরে পল্লব, একটা ভারচুয়াল রিয়ালিটি গেমের মত।

ওই ডাক্তারের কথা শোনার সময় তখনো পল্লব প্রাকমৃত্যু নোটটা পড়েনি। সেটা পড়ার পরেই ত্রিদিবের স্বেচ্ছামৃত্যুর গোটা প্রক্রিয়াটা স্পষ্ট হয়েছিল। একটা প্রতিশ্রুতি অপরিপূরণের পাপ অপনোদন করার কাহিনী লিখেছে ত্রিদিব, তার এই নোটে। নোটটাও ওই একই রকম -- গদ্য হিশেবে পড়তে বেশ লাগে, কিন্তু কী যে অর্থ বেশিরভাগ জায়গাতেই খুব স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। লেখাটায় বারবার একটা বাচ্চা মেয়ের কথা আছে। প্রথমে পল্লব ভেবেছিল, ট্রেনের ওই মেয়েটার কথা, যাকে পুলিশ টিকিট না-থাকায় ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। পরে বুঝেছিল, অনেক পরে, গোটা লেখাটা অনেকবার পড়ার পরে, না, এটা অন্য একটা মেয়ের কথা। পল্লবের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যারা তখন অত লাফিয়েছিল ত্রিদিব-তার-মৃতদেহ-তার-উপন্যাস নিয়ে, তারা কজন সত্যিই বুঝেছিল ওই সাড়ে নয় পাতার নোটস। নিজে বোঝার পর এগুলো নিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে পল্লব, জমিয়ে রেখেছে। উপন্যাসটা একবার হাতে এসে গেলে, তখন তা নিয়ে ওকে লিখতে হবে, তার উপাদান। সত্যিই কি উপন্যাসটা পাওয়ার কথা আর ভাবে পল্লব? নাকি, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু -- সেসব ভাবতে চায়না, কিন্তু বোঝে, যত দিন যাচ্ছে, ওই কথাগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে, না, থাক, ওসব সে ভাববে না, ভাবতে গেলেই ভয় ভয় করে তার। তার সাহসটা যদি একটু বেশি হত, একটুখানি, কতকিছু করতে পারত। মাথা তার খুব সাফ, নিজেই বোঝে পল্লব, সেই রকম হিম্মতটা যদি একটু বেশি হত।

ওই মেয়েটির কথা এবং নিজের সম্ভাব্য মৃত্যুপ্রক্রিয়া ছাড়াও একটা ছেলের কথা ছিল, যেমন,

> স্বচ্ছ সিলিকন অনচ্ছ শরীর সবই অ্যাকসিডেন্টাল ঐক্য, এসো কিশোর, তোমায় নেসেসারি করি, ইউনিভার্সাল, তুমি ভূমি কাল অতিক্রম করছ, কেমন লাগে বালক, রিলাক্সড ছিল মেঘের বরফকণা, উর্বরতায় বর্ষিত হওয়ার আশু মৃত্যু ছাড়া আর কিছু তার ঘটার নেই, চাঁদের রাত্তিরে বালিতে আর খেলোনি তুমি, তুমি নিজেই ক্রীড়ামোদ হও, আমি উত্তীর্ণ করি তোমায় ভূমি পেরিয়ে কালোত্তীর্ণতায়

এ বস্তু হজমের সাধ্য পল্লবের নেই, বা, তার মরে-যাওয়া একদা-পাতাখোর বাপের। যদি-না ওই জনশ্রুতিটা কানে আসত তার, যা ত্রিদিবের একটা গল্পতেও এসেছিল বলে শুনেছে, কিন্তু অনেক খুঁজেও পায়নি গল্পটা। রাজস্থানে ঠিক যে কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না। লোকের মুখে যা শুনেছে, ত্রিদিবের কারণে সেখানে একটি পনেরো ষোল বছর বয়সের ছেলের কিছু হয়েছিল। কী হয়েছিল তা কেউই জানে না। আসলে গল্প দিয়ে যদি ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়ানো হয় তাহলে যা হতে পারে। কী হয়েছিল? ত্রিদিব মেরে ফেলেছিল? কেন? ফুকোর মত বয়-লাভ? ত্রিদিব কি হোমো ছিল, এমন কিছু করেছিল যাতে ছেলেটা মারা যায়? ওসবের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে পল্লবের তাতে মেরে ফেলাটা তো ভীষণ ভীষণ শক্ত, ইন-ফ্যাক্ট অসম্ভব বলেই তো মনে হয়। তাহলে? ত্রিদিবের কোনো মানসিক অসুখ ছিল, কমপালসিভ কিলার? সাইলেন্স অফ দি ল্যাম্বস-এর অবিস্মরণীয় অ্যানথনি হপকিনস-এর মত?

বাবুর ভিসিডি ব্যবসার কল্যাণে কোনো সিনেমাই বাদ যায় না পল্লবের, এতে ভারি লাভ হয়েছে, সব কিছুই কোনো না কোনো সিনেমার সঙ্গে মিলিয়ে টক করে বুঝে যেতে পারে। কলকাতায় এমন কিছু হয়না যা আগেই বাইরে হয়নি, আর বাইরে এমন কিছু হয়েই উঠতে পারে না যা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হলিউড ফিল্ম বানিয়ে ফেলেনা।

ত্রিদিবের গোটা প্রাকমৃত্যু নোটটা পড়ে এটাই শেষ অব্দি মনে হয়েছে পল্লবের, কিছুই ঘটেনি রাজস্থানে, গোটাটাই স্রেফ বাওয়াল। আর কিছু না পেয়ে পাবলিক শেষে গল্পের বাওয়ালকেই এফআইআর হিশেবে পড়ার চেষ্টা করেছে। এটাও বারবার কানে এসেছে পল্লবের, রাজস্থানে কী ঘটেছিল তার পুরোটাই দেওয়া আছে ত্রিদিবের ওই শেষ উপন্যাসটায়, ত্রিদিব নিজেই লিখে গেছে। এটা শুনে গোটাটাকেই আরো বেশি করে ভাট বলে মনে হয়েছে। এসব হয় নাকি কখনো, মাল যদি খুন করেই থাকে, তাহলে সেটা লিখতেই বা যাবে কেন, যদি না সানকিয়ে গিয়ে থাকে? আর সানকিরা আর যাই করুক খুন করেনা। সানকিরা ইউজুয়ালি ভাল লোকই হয়, অন্যের দুর্দশা সইতে পারেনা, মানুষের আর মানুষীর কষ্টে কাঁদে, বস্তির বাচ্চাদের পড়ায়, যুদ্ধবিরোধী মিছিল করে, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। এরা নাঙ্গা হয়ে নাচতে পারে, রাত্তির দেড়টায় যদুবাবুর বাজারে তৃপ্তি বার থেকে সাত বোতল থান্ডারবোল্ট খেয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সিওলার সাথে ক্যাঁচাল করতে পারে, অতনুদার মত, সেই গান্ডু ট্যাক্সিওলা কেন ধানসিঁড়ি নদী চেনেনা, কিন্তু এরা খুন করতে পারে না, খুন করতে এলেম লাগে। এবং একই রকম বাওয়াল বলে তার মনে হয় কামরূপের বাচ্চা মেয়েটার গল্পটাও। ওই নোট থেকেই কয়েক লাইন তুলে দেওয়া যাক।

> কাগা সব তন খাইয়ো এখন সময় ভেঙে পড়ছিল জুঁই ফুলের পাপড়িতে জুঁই ফুল পাথর হয় যাবে তুমি পাথরে পাহাড়ে শুদ্ধ হবে শুদ্ধ হবে বলে চুন চুন খাইয়ো মাস পাথর মানে অপেক্ষা জমে জমে পাথর পাথরের চোখ নিষ্পলক পাথর শুধু চেয়ে ছিল বাধা দেয়নি দো-নয়না মত খাইয়ো শুধু মৃত্যুহীন হওয়া যায় পাথরের কাছে মৃত্যুও পাথর হল জমাট নির্বাক ইনহে পিয়া মিলন কি আস লেখক লেখক তুমি শুধু শরীর চেনো অশরীর শরীর দিয়ে তুমি অশেষ অনন্ত হতে জেনেছ কি জেনেছ কী করে পাথর হয় বাচ্চার আদুরে হাতে গাঁথা জুঁইফুলের মালা পাথর হয় বাচ্চার হাত আদর

এই বস্তু পড়ে মানে বোঝা পল্লবের পক্ষেও শক্ত হয়েছিল, বহুবার পড়ার পরেও, এমনকি এখনো সে নিশ্চিত নয়, আদৌ সে বুঝেছে, না, অন্য জায়গা থেকে একটু একটু বোঝা অর্থ বসিয়ে নিয়েছে এগুলোয়। মেয়েটির বিষয়ে কিঞ্চিত স্পষ্ট, না, ভুল হল, কিঞ্চিত কম অস্পষ্ট, অংশও আছে লেখাটায়।

> কন্যা, তুমি ভোরে উঠেছিলে, খুব ভোরে? মালা গাঁথার ফুল কুড়োবে বলে? ফুল পাড়তে নেই, জানো, ফুল কুড়োতে হয়, ফুল পাড়া মানে ফুলকে ফুলের মা-র থেকে কেড়ে নেওয়া। ফুলের কষ্ট হয়না, বলো? ভোরে উঠলে যখন, তোমার উড়োঝুরো চুলে সকালের আলো পড়েছিল? তুমি হেসেছিলে তখন? তোমার নিজের কোনো বিড়াল আছে? রাতে শুয়ে পড়ার পর, মা আসার আগে অব্দি তুমি

> কি ভয় পেয়েছিলে? একদিন আলতা দেবে পায়ে? দিয়ে বড় মেয়ে হবে, খুব বড় মেয়ে, যারা গাছকোমর করে আঁচল দিতে পারে গায়ে, তখন তাদের দেখলেই মনে হয় তাদের গোটা গ্রামে কোনো ভিতু লোক নেই। আলতা তুমি জানো? তোমার বিড়ালের লেজের মাথায় একটা সাদা-হলুদ ছোপ আছে? লেজের মাথায় ছোপ ছাড়া কি বিড়াল হয়? আমি তোমায় পাথরের তাল দিয়ে বিড়াল বানিয়ে দেব, ঝড়ের রাত্তিরের বাজ দিয়ে, দূরে চলে যাওয়া ট্রেনের ঝমাঝম দিয়ে। ট্রেনের চাকায় অমন শব্দ হয় কেন? ট্রেনরা কি নূপুর পরে? এ বিষয়ে কিছু জানা আছে তোমার?

বা, আর একটা অংশ, আগেরটায় যে মেয়েটার সঙ্গে ত্রিদিব সরাসরি কথা বলছিল, তাকে নিয়েই লেখা যেন। অথচ এটা এসেছে কিন্তু পরে। সচরাচর একটা লেখায়, আগে একটা চরিত্র ঢোকে, তার বিষয়ে কিছু জানানো হয়, তারপর সে গল্পের মধ্যে অংশ নেয়, সে কোনো কথোপকথনই হোক আর ঘটনাই হোক। ত্রিদিবের লেখায় দেখেছে পল্লব, এই গোটাটাই কেমন ঘেঁটে দেওয়া থাকে, যেটা যখন খুশি চলে আসছে। কিন্তু আসে তারা ঠিকই। যদি সমস্ত টুকরোগুলোকে নিজের মাথায় ফের সাজিয়ে নেওয়া যায়, গোটাটাই ফুটে ওঠে। এখানে সমস্যাটা হল, কী নিয়ম মেনে টুকরোগুলোকে ফের সাজিয়ে নিতে হবে সেটা লোকে বুঝবে কী করে? এত ভাল গদ্য -- এরকমটা কেন করত? এই ঘেঁটে না-দিলে অনেকগুলো লেখাই বেশ ভাল লেখা হত বলে মনে হয়। যাকগে, এখন সেই টুকরোটাকে তোলা যাক।

> কখন থেকে বসে আছে, সকালে শেষ কখন খেয়েছে? কী খেয়েছে ও? কী খায় ও, খেতে পায়, রোজই পায় খেতে? ফুটফুটে মুখ, কালো গাল, অন্ধকারে হলুদ লণ্ঠনের মত জ্বলন্ত-উজ্জ্বল চকচকে নড়ে বেড়ানো চোখের মণি, ও তো আমার মেয়ে হতেই পারত, পারত কি, সত্যিই পারত? প্রাকজন্ম সন্তান নয়, সত্যি প্রসবদ্বার বেয়ে সত্যিকারের জন্মানো কোনো মেয়ে? কেয়ার কি যোনি আছে, ভাল মনে করতে পারে না ত্রিদিব। নাকি, কেয়ার যোনি আছে, ত্রিদিবেরই কোনো লিঙ্গ ছিলনা? ছিল কি? শুধু লিঙ্গ নেই বলে তার অমন মেয়ে হলনা? মেয়ে যে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে হাঁটুতে চড় মেরে মেরে ছড়ার গান গায়, পাশের মেয়েটার গায়ের উপর ঝুঁকে ঘুমন্ত বিড়ালের লেজ পরীক্ষা করে, আর বেমালুম ভুলে যায় যে, মালা তাকে বিক্রি করতেই হবে, সকালের শিশির ভেজা জুঁই ফুলের মালা, মালা বিক্রি করে চাল হয়। কতগুলো জুঁই ফুলের পাপড়ি সমান এক কেজি চাল হয়? সব জুঁই ফুলই যদি চাল হয়, অমন মেয়ের গলা ফাঁকা থাকবে? কবে মালা আবিষ্কার হবে এই পৃথিবীতে?

এই অংশটায় এরকমটা অনেক আছে, হেভি লাগছিল পল্লবের। বাচ্চা মেয়েটা, তার চারপাশ নিয়ে এমন ভাবে মাথায় ঢুকে আসছিল। মাথার মধ্যে কেমন করছিল। আর সেই জন্যেই আরো মনে হয়েছে পল্লবের, ওরকম কোনো মেয়ে আদৌ ছিলই না। গল্পের বাচ্চা ছাড়া ওরকম করে লেখা যায়? জেনুইন বাচ্চাদের নিয়ে ঠাকুর দেখাতে গিয়ে বাপের নাম খগেন করে ফেলা যায়, অঙ্ক কষাতে গিয়ে তার মা কি পিসির সঙ্গে ঝাড়ি করা যায়, কিন্তু হারগিস ওরকম লেখা যায় না। লোকে শালা গল্পের

জিনিসপত্তরগুলোকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে বলেই যত কেলো। পাবলিকের যে কবে বয়েস হবে?

এই নোটগুলো পড়ার পরে, এক সাংবাদিক ত্রিদিবের স্ত্রী, তখন এমএলএ কেয়ার, কেয়া গুহর সঙ্গে দেখা করে। এই লেখার মধ্যেকার প্রসঙ্গগুলো ভেবে তখনো অস্বস্তি হয়েছিল পল্লবের। এ একটা কী বিদ্ঘুটে ধাঁচ ত্রিদিবের লেখার। অনেক লেখাতেই মূল চরিত্রের নামগুলো বাস্তব জীবন থেকেই নেওয়া। এরা নিজেরা কী ভাবে নেয় কে জানে। তবে কেয়া গুহ পলিটিকাল লোক, স্বস্তি আর অস্বস্তি দুই-ই প্রয়োজনমত হয়, কিন্তু এসব কায়দার মানে কী কে জানে। ত্রিদিবের স্ত্রী কি কখনো ত্রিদিবের লেখা পড়ে? তখন তার কী প্রতিক্রিয়া হয় ওইসব অদ্ভুত লাইনে? কে জানে, আসলে কী হয়। তবে সাংবাদিকের প্রশ্নে মহিলার কিছুটা ক্ষোভ বেরিয়ে এসেছিল। 'দেখুন, প্রতিটি দেশের নিজের কিছু প্রথা কিছু শিষ্টতা আছে, যে মরে গেছে তার বিষয়ে কোনো অপ্রিয় মন্তব্য করা অন্য দেশে কী হত জানিনা, কিন্তু আমাদের মূল্যবোধে আটকায়, তবে এটুকু তো বোঝেন, জীবনযাপনে জীবনচর্যায় যে ন্যূনতম শৃঙ্খলাবোধ নৈতিকতাবোধ সেটুকু না থাকলে একটা কালেক্টিভ জীবন তো সঠিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে না, আসলে ব্যক্তি বুদ্ধিজীবিরা আমাদের দেশে তো কোনোদিনই তাদের ব্যক্তি সুখের ক্ষুদ্রতম গণ্ডি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে শেখেনি, এনি ওয়ে, আমাদের যৌথ জীবন খুব সুখের হয়েছিল এরকম কোনো রূপকথা আমি বানাতে চাইনা, তবে যে ভাবে ত্রিদিবের গোটাটা শেষ হয়ে গেল সেটা তো দুঃখজনক বটেই, একটাই কথা, পরবর্তী প্রজন্মের লেখক শিল্পীরা যেন কিছু শেখে এখান থেকে'।

পল্লব কোথাও একটা ফিল করছিল মহিলার জন্যে। যার লেখা পড়তে গিয়েই সে ভিত্তার হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে জীবন কাটানোটা কী হবে সেটা সে ভেবে নিতে পারছে। আর লেখাই এত এলোমেলো যার, তার নিজের জীবনটা একটা রেলস্টেশনের মত হয়ে যাবেই, এটা বোঝাই যায়। কেয়া গুহ এসব ছেড়ে কামরূপের প্রসঙ্গে এসেছিলেন। 'এটা আমার মনে আছে, মাঝে মাঝে ও কামরূপের হারানো ফোটোগ্রাফগুলোর কথা বলত। ওগুলো ঠিক হারায়নি, অ্যাকচুয়ালি কামরূপ মন্দিরের সামনে ত্রিদিবের সঙ্গে লোকাল লোকদের একটা ঝামেলা বেধেছিল। সেটা ওর সব জায়গাতেই বাধত। সেখানে মন্দিরের সামনে একটা বাচ্চা মেয়ে বসে মালা বিক্রি করছিল। একা নয়, আরো ছিল। ত্রিদিব তো কখনোই খুব ব্যালান্সড ছিলনা। সব জায়গাতেই একটা একসেস। ও আসলে একসেসে বাঁচতেই ভালবাসত। এনি ওয়ে, এই পভার্টি চাইল্ড লেবার এগুলো তো সত্যিই পেইনফুল, তা ও সবগুলো মালাই কিনে নেয় বাচ্চাটার থেকে। তারপর ওকেই পরায় মালাগুলো। এই সময় মন্দিরের সামনে থেকে, ফ্রম নোহোয়ার কতকগুলো লোক চলে আসে। এসে সমস্ত বুজরুকি শুরু করে। কামরূপের মালা পরিয়েছেন আপনি, তার মানে বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটার সঙ্গে, ইত্যাদি। ট্যুরিস্ট দেখলে যেমন করে আর কী। ত্রিদিব এই সময় খুব চেঁচাতে শুরু করে, বাংলায়, ইংরিজিতে। ইংরিজিটা তো এসব জায়গায় কাজে আসেই। আমার সঙ্গেও একজন ছিল, একটু দূরে, সে লোকাল, যাই হোক, আমাকেও কিছু ফোনটোন করতে হয়, শেষ অব্দি মিটে যায়। কিন্তু এটা প্রায় পনেরো ষোল বছর আগের কথা। ও, তখন, ত্রিদিবের হাত থেকে ওর ক্যামেরাটা কেড়ে নেয় ওরা, ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়। পরে ফেরত পাওয়া যায়, তাতে রিল ছিল না। আমাদের ওখানকার লোকেরা অবশ্য দুঃখপ্রকাশ করেছিল। তাতে

ওই মেয়েটির কিছু ছবি ছিল। তা, এতদিন পরে, সেগুলো ত্রিদিবের মাথায় কোথা থেকে ফেরত এসেছিল সেটা বলতে পারব না। দেখুন, মাথা নিয়ে যারা একটু বেশি গ্লোরিফাই করে তাদের মাথা তো কিছু গন্ডগোল -- ঘটাতেই পারে, তাই না?'

কেয়া গুহর সাক্ষাতকারের এই শেষ বাক্যটায় এসে পল্লব একটু হোঁচট খেয়েছিল। এটা যদি সে লেখায় পড়ত তাহলে হত না। এই সাক্ষাতকারটা তুলতে ক্যামেরায় ছিল ইন্দ্র। এমনিতে চ্যানেল টুয়েন্টিটুতে আছে, কিন্তু বাংলা চ্যানেলে প্রায়ই খেপ খেলে। পল্লব মণিপুরী গাঁজা তুলতে পারলেই তাদের হাজরার আড্ডায় তখন আসত ইন্দ্র। ও মূল রাশটা দেখিয়েছিল পল্লবকে। শেষ বাক্যটার মাঝামাঝি এসে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড থমকেছিল কেয়া। কেন? কতবার নিজেকে এই প্রশ্নটা করেছে পল্লব। কেন? কিছু একটা বিশেষ কি বলার ছিল কেয়ার? কী? সরাসরি বলল না কেন? এমএলএ কেয়া গুহর বলার জায়গা তো কম নয়। তাহলে? এমন কিছু যা বলতে তার রুচিতে আটকেছিল? সেটা তো খুব ভালগার না হয়েও বলা যেত। তাহলে? বলতে খারাপ লেগেছিল? তাহলে তো বলাটাই আসত না, এবং, তার চেয়েও বড় কথা, একটা বিষণ্ণতা থাকত তাতে। বড়পিসিকে, নিজের চেয়ে এগারো বছরের বড় দিদিকে প্রায়ই মারত বাবা, হেরোইনের পয়সা না-দিলে। সেটা মাঝে মাঝে লোককে বলে ফেলত পিসি, কিন্তু কী আভ্যন্তরীন হিংস্রতাই না থাকত তাতে। হিংস্রতাটা আসলে নিজের প্রতি। ওই খারাপ লাগাটা কেয়া গুহর মধ্যে ছিল না। তাহলে কী ছিল? একটা সিগনাল দেওয়া যে আসলে আমার অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু সেটা বলা গেল না? কেন?

এই ভাবে ডিটেকটিভের মত ভাবতে গিয়ে একটা মজা পাচ্ছিল পল্লব। ভার্গব শার্লকী রকমের কথা এনেছিল। শার্লক আর ত্রিদিবের স্কালগত মিল। যেন এই আবিষ্কারটা পূর্বনির্দ্ধারিত ছিল। এখন, ত্রিদিবের লেখা, তার মৃত্যু এই গোটাটার একটা অংশ হয়ে পড়েছে পল্লব নিজেই। তাই, তাকে পল্লবকে যে এরকম শার্লকের মত করে ভাবতেই হবে, যদি গোটাটা বুঝতে চায়, এটারই ইঙ্গিত বোধহয় দেওয়া ছিল ভার্গবের করা শার্লকের ওই উল্লেখে।

ত্রিদিবের জন্যে একটু মায়া হতে শুরু করল পল্লবের। কি একটা গোপন যুদ্ধকে ও টের পাচ্ছিল, মালটা মরে গিয়েও যার থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। ঠিক ত্রিদিবের লেখার মতই, যা ও বুঝছে আর যা ও বুঝছে না, সেই গোটাটাই ঘেঁটে গেল পল্লবের কাছে। এটাতেই আরো বেশি করে মনে হতে শুরু করল পল্লবের, যা দেখছে, যা শুনছে, তার গোটাটাই কোনো একটা জায়গায় বানানো, নানা গোপন উদ্দেশ্য রয়ে যাচ্ছে তার ভিতর, যাদের কখনোই পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব না, কারণ, যা বুঝছে সেটা বোঝাই উদ্দেশ্যকে সার্ভ করা, নাকি, তার বিপরীতটা বোঝা, সেটা বোঝাবে কে? তার চেয়ে একটা গল্পকে গল্প হিশেবে পড়াই নিরাপদ, মনে হয় পল্লবের। নইলে বহু অংশই ও কী ভাবে বুঝবে, গল্প না বাস্তব, সেটাই ঠিক করে ওঠা যাচ্ছে না।

> সকালের সূর্যর প্রতিশ্রুতি সন্ধের অন্ধকারের প্রতিশ্রুতি সব প্রতিশ্রুতি ভেঙে যায়। ভেঙে যাওয়াও তো একটা যাওয়া। কোথাও একটা যায় তারা। কিন্তু প্রতিশ্রুতিরা আর কোথাও নেই। সবাই তাদের ভুলে গেছে। ইস্কুলের আলকাতরার স্মৃতি মাখা পচা ভেঙে যাওয়া মুলি বাঁশের বেড়া পেরিয়ে মুক্তি মুক্তি অ্যাকাডেমির হাত থেকে

> মুক্তি বড়দিদিমনিদের হাত থেকে। ফড়িং এসেছিল। ফড়িং-এর ডানায় বিদ্যুত থাকে, ফড়িং তার বিদ্যুত দিয়েছিল অকাতরে, দিচ্ছে যে এটা ভাল করে না-জেনেই, তাই হয়ত দিতে পারে। প্রতিশ্রুতি ছিল, তার ডিম থেকে ছানা ফোটার পর ফেরত যাওয়ার, সময় পেরিয়ে গেল দ্রুত, ফেরত যাওয়া হল না। ফড়িং নিজেই এল বহু বছর বহু কোটি বছর বহু যুগ অতীতে, জুরাসিক যুগে। ফেরত এল দুঃস্বপ্ন হয়ে, প্রতিশ্রুতি ভাঙার পাপের দুঃস্বপ্ন। জুরাসিক ড্রাগন ফ্লাই তার দানবিক আকার নিয়ে ফিরে ফিরে আসে, আতঙ্কে তুমি মুখ ঘোরাও, চোখ, কেন, রিফ্লেক্স? চোখ তো নেই তোমার আর, কালো কোটরের অন্ধকার শূন্যতা নিয়ে তোমার দুঃস্বপ্নই তোমার দিবাস্বপ্ন। সালাবৃকসঙ্গী অয়সায়ুধ অশ্বারোহী তোমার দৃষ্টি নিয়ে চলে গেছে তোমার চোখের কোটর থেকে, কার যাদুতে তুমি ফেরত পাবে তোমার দৃষ্টি, অরুণুখ যতিরাও নিহত, অনন্ত বালিতে বসে থাকো, তোমার দৃষ্টি অনন্তে মিশে গেছে, এখন থেকে তোমার দুঃস্বপ্ন দিবাস্বপ্ন শুধু কৌষীতকি কাহিনী। বালিয়াড়ি একদিন মরীচিকায় মেশে, তুমি এবার নির্ভার হও, তাই নিষ্পাপ, প্রতিশ্রুতি না-পালনের পাপ থেকে মুক্ত হতে যাও অন্তহীন যাত্রায়, সেটাই মুক্তি। প্রতিশ্রুতি তো পালনের ছিল না। কিন্তু, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাপের দায় তো নিতেই হবে। প্রাচীন মন্ত্রের তাই আদেশ। লুপ্ত অরুণুখ যতিদের আদেশ। আয়ুধ তাদের শরীর মেরেছিল, সালাবৃকরা মদির হয়েছিল তাদের রক্তে। কিন্তু তাদের আত্মা, তাদের মন্ত্র। নির্মল হও, অভিষিক্ত হও মৃত্যু পার হয়ে অনন্ত জীবনে, তবে তো তুমি যতিদের কাছে যাবে।

কার প্রতিশ্রুতি, কোন প্রতিশ্রুতি ভাঙা হয়েছিল। এই অংশটা, অন্তত শব্দগুলোর মানে, পল্লব বুঝেছিল অনেকদিন পর, আকস্মিক ভাবে। ইন ফ্যাক্ট একটা না, দু দুটো আকস্মিকতা কাজ করেছিল এখানে। একটা জুরাসিক ফড়িং। দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতায় একদিন পড়েছিল, জুরাসিক ফড়িং-এর আকার হত দানবিক, দশ বারো ফুট ডানা থেকে ডানা। ভাবার চেষ্টা করে এমনিতেই দুঃস্বপ্ন হচ্ছিল পল্লবের।

দ্বিতীয় আকস্মিকতাটা একটু ব্যক্তি প্যাথোজে ভরা। বড়পিসির কাছে দু-তিনটে ইন্ডিয়ার ম্যাপ ছিল, পিসির না, স্বদেশি করা ঠাকুর্দার। পল্লবের বাবা পয়সা না পেলে শিরা ফোলা ঘোলাটে চোখ নিয়ে পিসিকে মারত এই ম্যাপের লাঠিগুলো দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কনটিনিউয়িটি ছিল পারিবারিক উত্তরাধিকারের। একসময় স্বদেশী করত বলে, তখনো লোকের মধ্যে রমরম করছে দেশপ্রেম, প্রাকৃত লোকজনের কাছে অন্তত, হেভি প্রেস্টিজ পেত ঠাকুর্দা। তালতলার মোটর গ্যারেজগুলোর পিছনকার চোলাইয়ের ঠেকগুলোতেও সেরকম কিছু অ্যাডমায়ারার ছিল। ও রাস্তা মাড়ালে, দু-এক ভাঁড় চোলাই না-শেয়ার করে কিছুতেই আসতে দিত না তারা। নেশা করে ফিরলেই কলকাতার পার্টিশনের রাস্তায় মুসলমান কাটার বীররস ফের একবার চাগিয়ে উঠত তার। মুসলমান আর পায় কোথায়, নিঃসন্তান বিধবা মেয়েকেই পেটাত। পরে, বাবার টার্ন এল, বাবা আরো শির জিনিস, কাজকর্ম কোনোদিনই কিছু করতে হয়নি, প্রথমে বাড়ির সম্পত্তি, পরে বিধবা বোনের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি। সম্পত্তি কমে আসতে শুরু করার পর তাম্রপত্র-বাবা ভাঙিয়ে পত্র-চর্চা করার

চেষ্টা কিছুদিন করেছিল বাবা। কিন্তু ওসব আর কাটত না তখন। সেই ফ্রাস্ট্রেশনেই হয়ত ক্যালাত পিসিকে। লোকের কত ফ্রাস্ট্রেশন থাকে। সেই উত্তরাধিকার এক ভাবে চারিয়ে গেছিল পল্লবের ভিতরেও, মনে আছে পল্লবের। জানে না কেন, পিসি মাঝে মাঝেই ম্যাপগুলো বার করে হাত বোলাত, কী দেখত আর, চোখ তো তখন প্রায় পুরোটাই গেছে। সেদিন কড়া ককটেল করে, মানে, বাংলার উপর গাঁজা মেরে ফিরেছিল পল্লব। মাথার ভিতর আর বাইরে দুটোই যেদিকে খুশি যেমন খুশি নড়ছিল, ঘরে ঢুকেই কোনোক্রমে খাটের উপর এলিয়ে পড়েছিল পল্লব। হাত পা মাথা কিছুই আর ঠিকমত নড়ছিল না। চোখে পড়ল খাটের পাশেই মেঝেতে ঝুঁকে বসে আছে পিসি, ম্যাপগুলো দেখছে অন্ধ ভারতবর্ষ। অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে দেখে যাচ্ছে দেখে দু-চারবার অস্ফুটে ডাকল ত্রিদিব। কোনো সাড়া নেই, হাত নাড়ানো মানে বেজায় ঝামেলা, কতটা নিয়ে যেতে হবে তুলে অসাড় বাঁ হাতটা, বাঁ পা দিয়ে একটু খোচাল পল্লব। পিসি এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু তখনো মরেনি, মরেছিল অনেক পরে, নেশার মধ্যে সবটাই একভাবে টের পাচ্ছিল পল্লব, পিসি নড়ছে, অল্প কাতরাচ্ছেও, কিন্তু নড়তে পারছিল না পল্লব, আসলে নড়তে চাইছিল কি? মাল মরে গেলেই বা কী হয়, বেঁচে থেকেই বা কী হয়, নেশার মধ্যেই মাথায় আসছিল তার। সকালে খোয়াড়ি ভেঙে জাগতে জাগতে এটাই প্রথম মাথায় এল পল্লবের। পিসি তাহলে শেষ অব্দি তার লাথিতেই মরল। বাবার মুখ মাথায় এল পল্লবের। জিও গুদমারানি, তুমি বাঞ্চোত সত্যিই আমার বাবা।

পিসিহত্যার এই প্যাথোজটা একদিন মাথায় ফেরত এসেছিল। বা, হয়তো কিছু করার ছিল না। ম্যাপ গুলো বার করল। সে যা ম্যাপ, কাপড়ের সুতো অব্দি বেরিয়ে গেছে। সেই সময়, পিসির জিনিসপত্তর থেকে বেরোল অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া বই। তার একটা খুলে ওল্টাল। এবং, কি অদ্ভুত, সেই পাতাতেই বেশ কয়েকটা চেনা শব্দ। সোজা হয়ে বসতে হল পল্লবকে। মলাট তো নেই, বাঁ-দিকের পাতার উপর থেকে পড়ল, কৌষীতকি উপনিষদ। ৩৯ পাতা থেকে শুরু বইটা, আগের পাতাগুলো ছিঁড়ে গেছে। একটা একটা করে শ্লোক, আর তার অনুবাদ আর আলোচনা। ঠিক যে অংশটা পড়ে চমকেছিল পল্লব, সেই অংশটা হল,

> ত্রিশীর্ষাণাং ত্বাষ্ট্রম্ অহনম্, অরুণ্মুখান যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্ -- আমি ত্রিশীর্ষ ত্বষ্ট্রিপুত্রকে হত্যা করিয়াছি; আমি অরুণ্মুখ যতিদিগকে সালাবৃকগণের (মুখে) অর্পণ করিয়াছি

কৌষীতকির এই শ্লোকের আলোচনা থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস জেনেছিল পল্লব। ত্রিশীর্ষ মানে এখানে যতদূর সম্ভব সিন্ধু সিলের তিনশিংযুক্ত যোগীমূর্তি। বেদনার্ত অরুণ্মুখ যতিদের, যোগীদের হত্যা করে, নেকড়ে বা হায়নাদের মুখে, সালাবৃকদের মধ্যে বিতরণ করেছিল ইন্দ্র। যে যোগীরা তাদের যোগের উত্তরাধিকার পেয়েছিল ওই যোগীমূর্তির কাছ থেকে, সিন্ধুর উপাস্য।

চমকাল পল্লব। এর পরেই ওই আপাতহিব্রু অংশটা তার কাছে খুলে যেতে শুরু করল। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভাঙার শুরু সেই বাল্যে, ইস্কুলের বেড়ার ফুটো গলে বাইরে পালিয়ে যাওয়ার বাল্যে। এই বাল্য এই ইস্কুল পল্লব চেনে না। কিন্তু মাথায় তৈরি করে নিতে পারে ত্রিদিবের লেখা থেকে। পালিয়ে বাইরে যেত, সেখানে মুক্তির বিদ্যুত পেত ফড়িং-এর ডানায়। এ বিদ্যুত পল্লবও চেনে। ছোটবেলায় কতবার চমকে হাত সরিয়েও নিয়েছে। ফড়িংও অবশ্য কলকাতা থেকে লুপ্ত

হতেই চলেছে। এখন কলকাতায় আর মাঠ নেই, ঘাস নেই, গাছ নেই, তাই ফড়িং নেই, শুধু ফ্লাইওভার। ফড়িং-এর সঙ্গে মিলে সেই মুক্তি, তার যত যত প্রতিশ্রুতি, যত যত সম্পর্কের ভালবাসার বন্ধুত্বের তাও আর নেই, তাই তারা ফিরে আসে দানবিক দুঃস্বপ্ন হয়ে। এই প্রতিশ্রুতি না-পালনের পাপ, এ এক অন্ধত্বের অভিশপ্ততা। সেই অন্ধত্বের শুরু বহু যুগ আগে। বর্বর আর্যদের হাতে যোগীদের হত্যায়। তাদের সেই উত্তরাধিকারের কাছে ফিরে যেতে হবে, পাপ মোচনের দায় নিয়ে।

এই অব্দি ঠিক আছে, এর পরের অংশটা থেকেই অস্বস্তির শুরু। একাধিক ভাবে পড়া যেতে পারে এর পরের অংশটাকে। একটা তো অবশ্যই আমাদের চিন্তার ইতিহাসকে একটা নষ্ট প্রতিশ্রুতির আর মননের পরাধীনতার ইতিহাস হিশেবে পড়া, যে পরাধীনতার শুরু আর্যদের হাতে, আজ একে আর নেই করা যায় না, যা ঘটার ছিল তা ঘটবেই, বরং একে চিনে নিয়ে বাঁচতে শেখা যায়।

কিন্তু লেখাটুকুর অন্য একটা পাঠ খুব বেশি করে চারপাশ দিয়ে ব্যাকড হচ্ছে, প্রোমোটেড হচ্ছে, সেই পাঠটা হল, ওই জুঁই ফুলের মালা হাতে বাচ্চা মেয়ের ঘটনাটা দিয়ে পড়া। একে ব্যাক করছে ঘটনা। বিবৃত ঘটনা, মিডিয়ার বিবৃত ঘটনা, এমএলএ কেয়া গুহর বিবৃত ঘটনা। এখানে কামরূপ মানে তন্ত্র সহজিয়া, মানে অনার্য চিন্তাচর্চার উত্তরাধিকার। কামরূপের মালা পরানোর যদি একটা বিশেষ অর্থ থাকে, তন্ত্রের মন্ত্রের, ত্রিদিবকে তো সেটা তো মানতেই হয়। এমনকি চূড়ান্ততম না-মানার মধ্যেও একটা মানা তো রয়ে যাবেই, না-মানতে হচ্ছে মানেই ক্রিয়াটার প্রস্তাব শুরু মানা থেকে, যাকে নাকচ করা হচ্ছে। যা নেই তাকে কী করে কেউ না-মানে?

আবার, ওই বালিকা তো তার অনুপস্থিত নূপুর আর অনিশ্চিত বিড়াল নিয়ে ইতিমধ্যেই ত্রিদিবের মেয়ে হয়ে গেছে। তাই অনুচ্চারিত কিন্তু উপস্থিতির ফল্গুতে চারিয়ে যাওয়া মন্ত্রের প্রতিশ্রুতি তো সে মানতেও পারে না। তাই, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পাপ থেকে এবং প্রস্তাবিত কন্যাগমনের পাপ থেকে নির্মল হতে চায়, যোগীদের কাছে যাওয়ার মত নির্মল, স্বেচ্ছাশীল মৃত্যুর অনন্ত জীবনের নির্ভার নির্মলতা, জাপানি মংকদের মত।

এমনকি যদি এটা হয়ও, আবেগের, শূন্যতার, নিঃসঙ্গতার একটা চূড়ান্ত মোচড় থেকে এটাই ছিল ত্রিদিবের নোটের ইচ্ছিত অর্থ, এই নিউরোটিক অর্থটা কি খুব জরুরি? আর শুধু তাই নয়, যদি এমন হয়, আত্মহত ত্রিদিবের নোটকে এভাবেই পড়া হোক, এটাই কোনো উদ্দেশ্য, সেভাবেই সাজানো হয়েছে সব মিডিয়া বাস্তবতা সমস্ত কিছু। সে, পল্লব তো নিশ্চিত ভাবে কোনোটাই জানে না। সে শুধু খুঁজে যেতে পারে ত্রিদিবের হারানো গল্প, লুপ্ত উপন্যাস, প্রাকমৃত্যু নোটের অর্থ। সেই অর্থ খোঁজাটাবে নষ্ট করে দেওয়ারও কি কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কোনো রাজনীতি, একটা বৃহত্তর রাজনীতি, যা মিডিয়ার চেয়ে বড়, কেয়া গুহর চেয়ে বড়। পল্লবের চেয়ে তো বড় বটেই। ত্রিদিবের নোটেই ছিলনা এই অংশটা, আগেও কি পড়েছে? আজ, এই চিন্তাটা মাথায় আসার পর যেন একবার নতুন করে পড়ল, নতুন আবিষ্কার নিয়ে।

> আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাব্য মেথড, যা সত্য নয় এখনো, ফিকশন, সত্য হয়ে উঠছে, তাই পতিত হল ফিকশনের অমর্ত্যের অসম্ভব অনন্ত সম্ভাব্য থেকে মৃত সম্ভবের বিবরণে

ত্রিদিব এটা কি নিয়ে বলেছিল, নিজের মৃত্যু নিয়ে? নাকি সাবধান করে গেছিল লেখার অর্থ নিয়ে ওই সম্ভাব্য রাজনীতির বিষয়ে? ফিকশনের অমর্ত্যের অসম্ভব অনন্ত সম্ভাব্যকে, বহু-কে, সম্ভব তাই ঘটে যাওয়া তাই একেশ্বর তাই মৃত অর্থের শবে টেনে আনার রাজনীতি? কি ছেঁড়া যায় ত্রিদিব সত্যিই কি অর্থ করেছিল তা দিয়ে? সত্য? তার বাবার নাম ছিল সত্যসাধন।

একবার এভাবে ভেবে নিতে শুরু করার পর থেকে সব কিছুই বদলে যেতে শুরু করল পল্লবের। এখন যখন সে 'এবং পঞ্চেন্দ্রিয়' -র মিটিং-এ যায়, অন্যরা বোঝে না, সেটাই ডবল মজা গোটা ব্যাপারটার, পল্লব নিজের মধ্যে দু-তিনটে পল্লবকে খুঁজে পায়। এখনো আগের মত স্মার্ট কথা বলে পল্লব। বরং স্মার্ট কথা বলা নিয়ে টেনশনটা মিটে গেছে বলে বোধহয় আরো বেশি করে আসে ওগুলো। এই তো গতকালই, অতনুদা বলল, ইংরিজির মজাটাই আলাদা, ভাব তো, এটার কোনো বাংলা হয়, ইফ ইউ হ্যাভ গট ইট, ফ্লন্ট ইট। এক সেকেন্ড না-ভেবেই বলে দিল পল্লব, কেন, আছে -- তাই নাচে। বলে ফেলল বলে কোনো মন খারাপও হল না। অনেক বড় একটা ব্যাপার এখন সে বয়ে নিয়ে চলেছে। আগেও এটা যে মাথায় আসেনি তার তা নয়। ত্রিদিবের উপন্যাসটা নিয়ে এই সম্ভাবনাটা তার মাথায় আগেও এসেছে। কিন্তু অকারণ নানা কিছু ভেবেছে। এখন সে জানে, সে কেউ নয়, ত্রিদিব কেউ নয়, সবার চেয়ে অনেক বড় একটা জিনিস এখন চিনে গেছে সে।

যে কোনো কিছুই এখন ভারি মন দিয়ে দেখে, পড়ে, পাঠ করে পল্লব। আগে অতনুদার মাতলামিতে মজা পেত বা বিরক্ত হত পল্লব। গোটা কলকাতার সংস্কৃতিচর্চাটাই যে চলছে দাম্পত্যে অসফল প্রাক্তন নকশালদের অপরাধবোধ বিক্রি করে, এটা নিয়ে তার দু-একটা রাগী কিন্তু স্মার্ট কথা তাদের সার্কেলে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। এখন এর কোনোটাই তার কাছে রাগ বা আনন্দ বা দুঃখ কিছু নিয়েই আসে না। সে শুধু লক্ষ্য করছে নোট করছে মাথায় লিখে রাখছে নানা ডিটেইলস। সেদিন অতনুদা মাল খেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছিল। খুব। একসময় খেয়াল করল পল্লব, অতনুদার লিঙ্গ শক্ত হয়ে উঠছে, আগে হলে ভারি অপমানিত বিরক্ত হত, ভায়োলেটেড মনে হত নিজেকে। সেদিন মনে হল, মালের রেতঃপাত বরং হয়ে যাক। অরগাজমের মুহূর্তে মালটা ঠিক কী করে সে জেনে যাবে। তুলে রাখতে পারবে সেই উপন্যাসের, ত্রিদিবের উপন্যাসের জন্যে। সেটা পল্লব নিজেই লিখবে। তারপর চালাবে ত্রিদিবের নামে। এটা করতে গিয়ে সব কিছু শিখতে হবে তাকে, অনেকটা পড়াশুনো, ত্রিদিবের লেখায় এত বাইরের রেফারেন্স থাকত। শেখাটা শুধু সেখানেই থেমে থাকবে না। চলবে। পাণ্ডুলিপি জালিয়াতি অব্দি শিখতে হবে তাকে। পল্লব উপন্যাসটা খুঁজছে, এখন নিজের মধ্যে। তাই উপন্যাসটা নিয়ে ত্রিদিবের একটা উদ্ধৃতি, প্রাকমৃত্যু নোটেই যা পেয়েছে, ভয়ানক সত্যি হয়ে উঠতে দেখছে, যেন ত্রিদিব পল্লবের জন্যেই লিখেছিল বাক্যটা, যখন পল্লবের আরব্ধ এক থেকেও খোঁজার এলাকাটা অতীত থেকে ভবিষ্যত হয়ে গেছে, এমন একটা উপন্যাসের জন্যে

> যা একই সঙ্গে জীবন ও অন্ধ হওয়ার পর দিবাস্বপ্ন, যা একই সঙ্গে একটা টেক্সট এবং হত্যা আকাঙ্খা, তুমি এই উপন্যাসকে নড়তে দেখলে বাক্যের টেন্স জুড়ে, অতীতকে দেখছ পুনরাবৃত্ত নিত্য বর্তমান, যাকে তুমি পড়তে চাইবে, কারণ, এটাই তোমার একমাত্র পরিচিত উপন্যাস, উপন্যাস যা তুমি লিখেছিলে তোমার ভবিষ্যতে